৭।৬।০৭

১

প্রতিধ্বনি

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা
ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়
মালিগাঁও, গুয়াহাটী
২০০৭

প্রতিধ্বনি

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়
মালিগাঁও, গুয়াহাটী
২০০৭

প্রতিধ্বনি
বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা
ললিত চন্দ্র ভৰালী মহাবিদ্যালয়
মালিগাঁও, গুয়াহাটী-৭৮১০১১

পঞ্চম প্রকাশ ঃ
ফেব্রুয়ারী-২০০৮

ডি.টি.পি. এবং ছাপা ঃ
বন্দনা এন্টারপ্রাইজ
মালিগাওঁ চারিআলি
গুয়াহাটী - ৭৮১ ০১১

Office of the Principal
LALIT CHANDRA BHARALI COLLEGE
Maligaon, Guwahati-781 011, Assam (India)
Ph. : (0361) 2570465, 2675259, Fax : 0361-2570466

Dr. N.K. Deka, M.Sc., Ph.D.
Principal & Secretary

শুভেচ্ছা বাণী

ললিত চন্দ্র ভৰালী মহাবিদ্যালয়ৰ বঙলা বিভাগৰ মুখপত্র 'প্রতিধ্বনি' পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশৰ আয়োজন কৰা বুলি জানিব পাৰি সন্তোষ পোৱাৰ লগতে গৌৰৱ বোধ কৰিছোঁ। এই মুখপত্রৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তথা ছাত্র-ছাত্রীসকলে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিকর্ম বিকাশৰ লগতে সমাজৰ বৌদ্ধিক জগতলৈ অৰিহণা যোগাব বুলি আশা কৰিলোঁ।
ইতি -

ড° নিশিকান্ত ডেকা
অধ্যক্ষ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড০ নিশিকান্ত ডেকা মহাশয়কে বিশেষ ভাবে কতজ্ঞ জানাই আমাদের ৫ম সংখ্যা "প্রতিধ্বনি"কে শুভেচ্ছাবানী জানাবার জন্য। কর্তৃপক্ষের সবল নেতৃত্ব এবং একই পরিবারে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রী, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রীদের দায়বদ্ধতার জন্য আমরা আজ পাঁচবছর ধরে সাহিত্য পত্রিকাটি প্রকাশ করতে পারছি। এই অবকাশে শ্রীমাধব শর্মাকে ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি। সর্বশেষে, শ্রীসুদর্শন সিন্‌হাকে ছাপার কাজের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। 'প্রতিধ্বনি' বাংলা বিভাগ, মহাবিদ্যালয়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করার এক প্রতিশ্রুতি।

প্রস্তাবনা

"--- সভ্যতার রথ এসে একবিংশ শতিকায় ঘুরছে, তাই আমরা আজ শান্ত-সমাহিত সভ্য। কিন্তু আমরা কি সত্যিই সভ্য হতে পেরেছি, শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছি.....

আমাদের সমাজ গত সভ্যতা ঠিকসেই পিলসুজটির মতোই, গোড়ায় যার অন্ধকার। নইলে দিশপুর-বেলতলার মতো জায়গায় এধরনের ঘটনা কি করে ঘটে? আদিবাসী অনগ্রসর জনগোষ্ঠীতো কেবল তাদের অধিকারের প্রতিধ্বনি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু কে জানতো, অরণ্যের অন্ধকার থেকেও গভীর ভুয়া সভ্যতার অন্ধকার তার সর্বগ্রাসী লোলজিহ্বায় তাদের গ্রাস করে নেবে? রমনীটির পরিজনেরা কোন পাশা খেলায় নেমেছিল যে তাকে এ যুগের দ্রৌপদী হওয়ার জন্য নির্বস্ত্র হতে হয়েছিল।

আমরা ভারতীয়! কোথায় গেল আমাদের সেই সংস্কার, সৌজন্য, সংস্কৃতি আতিথেয়তা? হীন রাজনীতির চক্রান্তে পরে তসলিমা নাসরিনেকেও আশ্রয়ের জন্য ভাবতে হয়।

সাহিত্য একদিক থেকে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আবেদনের প্রতিধ্বনি। 'প্রতিধ্বনি'র প্রতিটি সুরের প্রতিধ্বনিতে অনুরনিত বানী যেন তাদের প্রতিবাদকেই সোচ্চার করে তোলে, যারা সমাজ থেকে অবহেলিত, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।"

ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র 'প্রতিধ্বনি' র ৫ম সংখ্যা (২০০৭-২০০৮) প্রকাশিত হলো। প্রতিবছরের মতো এবারেও বিভাগের বাইরে থেকে লেখা এসেছে এমনকি মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকারাও তাদের লেখা দিয়েছেন যা সংখ্যাটিকে এক আলাদা মর্যাদা প্রদান করেছে।

বাংলা বিভাগ

ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়

বিষয়সূচী

গদ্যাংশ

১।	জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি চেতনা	পাপড়ি সেনগুপ্তা	৭
২।	বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ	শিবানী দে	১০
৩।	শারদীয় অনুভবের কিছু প্রাসঙ্গিকতা	শ্রীমাধব শর্মা	১৫
৪।	আমাদের আত্মাদের রক্ষা কর	ডঃ সুনন্দা দাস	২২
৫।	তেমনটা আর দেখিনা	রঞ্জনা সেন	২৫
৬।	রুট নং-৬	রাজীব সাহা	২৬
৬।	বৃদ্ধার চাতুরী	দীপিকা দাস	২৮
৭।	একটু হাসো	দীপিকা দাস	২৯

কবিতাগুচ্ছ

১।	ঘুণ	রাজীব সাহা	৩০
২।	আমার ইচ্ছে	তনুশ্রী রায়	৩০
৩।	শিক্ষাগুরু	পায়েল ধর	৩০
৪।	হৃদয়ের গান আজ বন্ধ	নীলিমা গোস্বামী শর্মা	৩১
৫।	পালা বদল	অলি ভট্ট	৩১
৬।	বুক জুড়িয়া	নীলিমা গোস্বামী শর্মা	৩১
৭।	বর্ষা	প্রিয়ঙ্কা চৌধুরী	৩১
৮।	দুটি ভাবনা	ডঃ সুনন্দা দাস	৩২
৯।	পঙ্গুর বসন্ত	শিবানী দে	৩২

জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি চেতনা

পাপড়ি সেনগুপ্তা
বাংলা বিভাগ
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান

জীবনানন্দ প্রকৃতির একান্ত সত্তা থেকে জেগে ওঠা এক স্বতন্ত্র ধারার কবি। প্রকৃতির রূপ- রস- গন্ধ- বর্ণ এবং গুণ কে গ্রহণ করে তিনি পরিপূর্ণ। কোন খণ্ড দিয়ে তাঁর বিচার হয়না। তিনি অখণ্ড আত্মার প্রতীক। তাঁর কবিতায় এমন কিছু জিনিষ এসেছে যা পূর্ববর্ত্তী কোন কবির কাব্যের কৌলিন্য বাড়ায়নি। তাই মুথা ঘাস, গোলাপতার ছাউনি, ঝাউবন, হোগলাবন, বিড়াল, বক, শালিখ, বট, অশ্বত্থ সবই তার কাব্যের জগতে সমান শ্রদ্ধার স্থান পেয়েছে। পল্লীর মানুষজন নগর জীবনের মানুষ কেউ তাঁর চোখের অন্তরালে পরে থাকেনি। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি এসেছে সম্পূর্ণ নতুন বক্তব্য নিয়ে। নিরবধি কাল তাঁর কবিতার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। কবি জীবনের আনন্দ বেদনা প্রতিবাদ সবই প্রকৃতিকে নির্ভর করে উপস্থিত হয়েছে। এর বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে কবির শ্রেষ্ঠ কবিতার পৃষ্ঠায়।

১৯২৭ সালে ঢাকা থেকে 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় জীবনানন্দ এবং বিষ্ণুদের প্রচুর কবিতা ছাপা হত। এরও কিছুদিন পূর্বে কল্লোলে জীবনানন্দ স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় ছিল এক অনির্বচনীয় সুর। যা মুগ্ধ করেছিল বহু প্রতিভাকে। বুদ্ধ দেব বসু বলেছেন সেই সময় জীবনানন্দের কবিতা আরও বেশি মাত্রায় প্রকাশিত হচ্ছিল, উল্লেখযোগ্য 'পিপাসার গান' এবং 'অনেক আকাশ'। যে সময় কবির বহু কবিতা একে একে প্রকাশিত হচ্ছিল সেই সময় কবি কে অকারণ নিন্দার্হ হতে হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর কবি জীবনের আরম্ভ থেকে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এক অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা তিনি আক্রান্ত হয়েছেন।

আরও দুখের বিষয় সি টি কলেজে অধ্যাপনা করার সময় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অন্তর্গত 'ক্যাম্প' কবিতা লেখার জন্য অশ্লীলতার নির্বোধ অভিযোগে তিনি চাকুরী থেকে অপসারিত হন। অবশ্য মহৎ কবি কখনও নিন্দার ঘায়ে মুর্ছা যাননা, বরং বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে আরও এগিয়ে যান।

জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব ধারা আবিস্কার করেছেন, এই কবির কবিতা তাৎক্ষণিক উন্মাদনা দেয়না, অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করলে তাঁর কবিতার ব্যঞ্জন্য ধরা পরে। তাঁর প্রকৃতি চেতনার জন্ম হয়েছিল অতি শৈশবে, জন্মভূমি বরিশালের অফুরন্ত স্নেহধারায়। কবি বন বনানীর মাঝে কীর্তিনাশা জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ঘেরা সবুজ ডাঙায় বিচরণ করেছেন। ঘন ঝাউবন পেরিয়ে দীর্ঘ পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে লাশকাটা ঘর পেরিয়ে শ্মশান ঘাটের দিকে, সবই

কবির জীবনে একান্ত আপন। প্রকৃতিকে শৈশব যেকে চিনেছেন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসোবে। বগুড়া রোগে এক অনাড়ম্বর ঘর থেকে দেখেছেন কৃষ্ণচূড়া গাছের ফাঁকে চতেল রোদে খেলা করেছে ছোট বিড়াল ছানা। কৃষ্ণচূড়া গাছ, বিড়াল শাবক, মানুষ সব তাঁর কাছে এক সত্তা, প্রকৃতির বিস্ময় এই বিরাট পৃথিবীর অচ্ছেদ্য বন্ধন। এই প্রকৃতির ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করেছেন গভীর ভালবাসায়, এখান থেকেই জন্মলাভ করেছে তাঁর চেতনা সমৃদ্ধ গভীর জীবন দর্শন, প্রত্যয়ও প্রতিতী। জীবনের আনন্দ কে গ্রহণ করেছেন প্রকৃতি থেকেই, আবার বিচ্ছেদ বেদনাকে উপলব্ধি করেছেন সেও প্রকৃতি থেকেই। মহাপৃথিবীর অন্তর্গত 'হায়চিল' কবিতায় সেই গভীর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে অত্যন্ত পরিছন্ন ভাবে---

'হায় চিল, সোনালি ডানার চিল,
এই ভিজে মেঘের দুপুরে তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদোনাকো
ধানসিড়ি নদীটির পাশে'

সবুজের মৃদু আহ্বানে বিমুগ্ধ কবি তার সত্তা উপলব্ধির আশায় বারে বারে আত্মনিবেদন করেছেন ঘাসের একান্ত আত্মিক সত্তায়। কবি প্রকৃতির কাছে ফিরে আসতে চেয়েছেন—

'হয়ত মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে,
আবার অসির ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়'

বোধ এবং উপলব্ধি এত গভীর ছিল বলেই খণ্ডকে অখণ্ডের মাঝে বিলীন করার ঔদার্য এবং সাহসিকতা তিনি অর্জন করে নিয়েছিলেন।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাইনা আর

এই গভীর ইন্দ্রিয় চেতনার আত্ম প্রকাশ বা তাঁর Sensuousness হয়ত ইংরাজ কবি Keats এর চাইতেও কোন কোন ক্ষেত্রে ছিল আরও বেশি ব্যাপক, আরও বেশি সংবেদনশীল। যা কিছু সত্য তাকে তিনি প্রকৃতি থেকেই উন্মোচন বা উদঘাটন করেছেন। জীবনের একান্ত বাস্তব কে জানতে দিয়ে বলিষ্ঠ কবি কখনও হয়ত রূঢ় বাস্তব অথবা রূঢ় সত্যকে প্রকাশিত করেছেন অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্যে, তার প্রয়োজন ও অবশ্য স্বীকার্য। মহৎ চেতনার স্থানে, গভীর উপলব্ধির জগতে পৌঁছ বার এটি হচ্ছে অতি প্রয়োজনীয় সোপান, যাকে কবি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। To reach up to the soul the body is an indispensible medium. ইংরাজ কবি Robert Browning এর মত এই উপলব্ধি জীবনানন্দের ছিল।

কবি পল্লী প্রকৃতির স্নিগ্নতা যেমন দেখেছেন, দেখেছেন city life বা নগর জীবনের বিধ্বংসী কোলাহল।

মন্বন্তর, দাঙা রাজনীতি, রুগ্ননীতি। দুচোখ মেলে লক্ষ্য করেছেন নগরের রাস্তাঘাট, শেষ ট্রামের শব্দ মুছে গিয়ে কলকাতায় জীবন জগত ও অন্তিম নিশীথ কিছুই তাঁর অবলোকন থেকে বাদ যায়নি। নিপীড়িত সমাজ কে সমালোচনা করেছেন কঠিন ভাবে। কুষ্ঠরোগীকে হাইড্রাণ্ট খুলে তৃষ্ণা মেটাতে দেখেছেন, দেখেছেন সভ্যতার সঙ্কট, বস্তুবাদী সভ্যতার করুণ পরিণতি। সোঁদা-ফুট পাথে ভিখিরীর দল, চেতলার হাট, টালার জল, ভিখিরীর চরম কষ্ট, যাদের একটি পয়সা দিতে নারাজ সম্পন্ন ঘরের বধূ। যুদ্ধ, মন্বন্তব, ৪৭ এর দেশবিভাগের সাক্ষী কবি। নিম্নবিত্ত

মধ্যবিত্ত জীবনের চরম বঞ্চনা, সমাজ ব্যবস্থার চরম অন্যায় দেখে কখনও কখনও মর্মাহত কবি। গভীর দুঃশ্চিন্তায় আতঙ্কিত কবি তাই বলেন----

'মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর।
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল'

এই অবক্ষয় পশু সমাজের মূল্যহীনতা এবং বৈষয়িক চিন্তায় ব্যাকুল মানুষের জন্য তাঁর শেষ আশার বাণী উচ্চারিত হয়েছিল অত্যন্ত প্রকট ভাষায়। তিনি দেখে ছিলেন প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষকে বহু দূরে সরে যেতে, দেখে ছিলেন প্রেম ভালবাসার বঞ্চনা, যেটি মানুষের জীবনে সব চাইতে বেশি প্রয়োজন। তাই সর্বংসহা প্রকৃতির কোলে ফিরে এসে মানুষকে গভীর গভীরতর অসুখ থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন। কারণ তিনি দেখেছেন সমুদ্র নীল, ঝিনুকের গায়ে আলপনা, পাখীর কল্লোল, বসন্তের গান, ধৈর্যের প্রতিমূর্ত্তি প্রকৃতি রূপে এসেছে কল্যানময়ী নারী 'সুরঞ্জনা' বহু মৃতদের রোল বুকে ধারণ করে ও যে সে ভোরের কল্লোল। কবি বহু পথ পরিক্রমা করে অবশেষে উপস্থিত হয়েছেন নাটোরের বনলতা সেনের কাছে। এও প্রকৃতির ঐশ্বর্যের আর একটি দিক, যে প্রকৃতি কে তিনি পরম শ্রদ্ধায় পরম আশ্রয়দায়িনী রূপে মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরই কাছে তিনি চেয়েছেন পরম আশ্রয়———

'ফুরায় এজীবনের সব লেনদেন।
থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

সর্বশেষে কবির আশা ---

'মানুষকে সেতু থেকে সেতু লোক পার হতে হবে'

তিনি বলেছেন ----

'তবু আদি ব্যথা হবে কল্যানী
জীবনের নব নব জলধারা উজ্বল জগতে।'

****

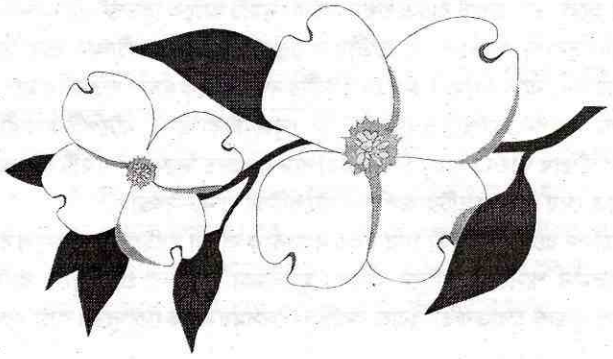

বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ

(প্রাক রামনারায়ণ পর্ব)

শিবানী দে
বাংলা বিভাগ

মানুষ প্রবৃত্তির দাস। অনুকরণ করাও এক ধরণের প্রবৃত্তি। কারো বিশেষ কিছু ভঙ্গী দেখে অনুকরণ করার প্রবৃত্তি অনেকেরই আছে। নাটকও বস্তুতঃ অনুকরণেরই নামান্তর। কারণ এই অনুকরণ থেকেই নাটকের সৃষ্টি হয়েছে। আদিম যুগে মানুষ যখন পশু শিকার করে জীবিকা অর্জন করতো তখন থেকেই তাদের মধ্যে নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল। এই নৃত্যগীত হলো নানা অঙ্গভঙ্গী ও মুখ দিয়ে নানা শব্দ করে কোনো কিছু অভিনয় করে দেখানো। পুরুষরা বা যারা শিকার করতে যেতো, তারা শিকার থেকে আহার্য নিয়ে ফিরে আসলে একটা উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হত, তখন নারী, শিশু, বৃদ্ধ অর্থাৎ যারা শিকার করতে যায়নি, তাদের কাছে শিকারের ঘটনা, শিকার করতে গিয়ে নানা অভিজ্ঞতার বর্ণনা ইত্যাদি পুরুষরা নৃত্যগীতের মাধ্যমে এদের সামনে অভিনয় করে দেখাতো। নানা action কে acting করে দেখানো থেকেই নাটক বা অভিনয় শুরু হয়েছিল। আজও মানুষের মনকে যা আকর্ষিত করে বা যা মানুষের মনে দাগ কাটে এই ধরণের কোনো ঘটনা বা typical কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য- এসব মানুষ পুংখানুপুংখরূপে অনুকরণ করে অভিনয়ের দ্বারা দর্শকদের মনোরঞ্জন করে নিজেও আনন্দ পেতে চায়। এই মনোবৃত্তি থেকেই নাটকের সূত্রপাত। কৃষিকার্য আবিস্কার হওয়ার পর সভ্যতা যখন ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগলো তখন অবসর বিনোদনের জন্য মানুষ অভিনয়কেই বেছে নিয়েছিলো।

নাটকের সূচনা কাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও খৃঃ প্রথম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচুর সংস্কৃত নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে, এ নিয়ে বিশেষ কোনো মতভেদ নেই। তবে অলংকার সমৃদ্ধ কবিত্বসম্পন্ন এই নাটকগুলো শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য রচিত ও অভিনীত হয়েছিল বলে সাধারণ লোক এর রসগ্রহণ করতে পারেনি। সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধরণের নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। কণিষ্কের সভাপতি অশ্বঘোষের রচিত "শারিপুত্র প্রকরণ"-ই হলো ভারতবর্ষে রচিত প্রথম নাটক। নয়টি অংকে বিভক্ত এই নাটকটি পাওয়া যায় মধ্য এশিয়ার তুরফান অঞ্চলে। খৃঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে নাট্যকার ভাস তার নাটকগুলি রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। খৃষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম নির্দশন চর্যাপদেও নৃত্যগীতাদি , বুদ্ধনাটকাভিনয়, নটপেটিকাধারী কাপালিকের নৃত্যগীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১০ নং চর্যাপদে ব্যবহৃত 'নড়এট্টা' শব্দটি ভ্রাম্যমান নাট্যদলের কথাই ইঙ্গিত দেয়। এই শব্দটির অর্থ হল নটপেটিকা বা নট-সজ্জা।

চর্যাপদ রচনার পরবর্তী প্রায় ২০০ বৎসরকে বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যাযুগ বলা হয়। তখন বাংলা মুসলমান শাসনের অধীনে আসে। মুসলমান শাসনের প্রথমদিকে বাংলায় লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, চূড়ান্ত অরাজকতা বিরাজ করছিল। সেসময় নাটক তো দূরের কথা, কোনো সাহিত্যই

রচিত হয়নি। কোনো কোনো মুসলমান শাসকের রাজত্বকালে- যেমন, হোসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলা সাহিত্যের অনেক উন্নতি সাধন হলেও নাটক, অভিনয় ইত্যাদির এরা ঘোর বিরোধী থাকায় এদের রাজত্বকালে নাটক রচনার কোনো ঐতিহাসিক নজির পাওয়া যায় না।

চর্যাপদের প্রায় দুই আড়াইশ বৎসর পরে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" গীতিনাট্যের আভাষ পাওয়া যায়। "চৈতন্য মঙ্গল", "চৈতন্য ভাগবত", "চৈতন্যচরিতামৃত"- এই চৈতন্য জীবনী গুলিতে চৈতন্যদেব কৃষ্ণের দানলীলার যে অভিনয় করেছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলায় রাধাকৃষ্ণের কাহিনী খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। বৈষ্ণবধর্মের বহুল প্রচার ও প্রসারের ফলেই রাধা ও কৃষ্ণের কাহিনীকে অবলম্বন করে যাত্রা-গান, পালা গান, ইত্যাদির জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। তবে ভক্তিরস ও গীতিরসই এদর মুখ্য অবলম্বন ছিল, যার ফলে নাটকীয় রস সেখানে প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি।

বাংলা নাটক বা পালাগানের প্রথম রচয়িতা হিসাবে যার নাম উল্লেখ করা যায়, তিনি হলেন চন্দ্রশেখর আচার্য। তিনি 'শেখরী যাত্রা' ও 'হরিবিলাস' নামে দুটো পালা রচনা করেন। দ্বিতীয় বাঙ্গালী নাট্যকার হলেন শিশুরাম অধিকারী। তার প্রবর্তিত যাত্রার নাম ছিল 'কালীয়দমন'। সেসময় যাত্রা বা পালাগান নানা নামে পরিচিত ছিল। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন। সেসময়ের আরো কয়েকজন বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা হলেন পরমানন্দ অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, লোচন অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত এখানে ঢপ কীর্তনের কথাও উল্লেখ করতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যশোহরবাসী মধুসূদন কান নামে এক গায়ক নিজের পরিবারের সকলকে নিয়ে একটি কীর্তনের দল গঠন করেছিলেন-তাকেই ঢপ কীর্তন বলে জানা যায়। হালকা সুর, তাল, লয় প্রয়োগ করার ফলে ঢপ কীর্তন কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

মধ্যযুগের সাহিত্যকে একদিক দিয়ে Performing Art বলা যায়। সেসময় বেশীর ভাগ লোকই নিরক্ষর ছিল। তাদের যেমন নাটক, যাত্রা বা পালাগান উপভোগ করার শখ ছিল, অন্যদিকে যে সকল সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনা করছিলেন, তারাও চেয়েছিলেন তাদের রচনা দর্শক পাঠকদের সমাদর লাভ করুক। কারণ পাঠক দর্শকদের কাছে না পৌঁছলে সাহিত্য সৃষ্টির সার্থকতা নেই। সুতরাং দরকার অভিনয়ের- এজন্যই গীতিনাট্য বা পালাগান মধ্যযুগে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য বস্তু ছিল। এপ্রসঙ্গে জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলোতে গানে গানে উক্তি প্রত্যুক্তি রয়েছে। মধ্যযুগে এগুলো সফলতার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে বলে মনে হয়।

মধ্যযুগে কৃষ্ণযাত্রা অধিক প্রচলিত হলেও রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, শিবযাত্রা, মনসার ভাসানযাত্রা, মহাভারতের কাহিনী ইত্যাদিও পালা হিসাবে অভিনীত হত। এগুলোতে পাঁচালীর পয়ার ছন্দে রচিত ছড়া ও গান থাকতো। শুরুতে পাঁচালীতে একজন মাত্র গায়ক থাকতেন, তার একহাতে মন্দিরা, একহাতে চামড় ও পায়ে নুপুর থাকতো, ক্রমে পাঁচালীর প্রসার ও পালাগানের দীর্ঘতার ফলে একজনের স্থলে দুই বা ততোধিক গায়ক ও অভিনেতার আমদানি হতে লাগলো।

এভাবে পাঁচালীর বিস্তৃতি থেকেই যাত্রার উদ্ভব হয়। ডঃ সুকুমার সেনের মতেও পাঁচালী থেকেই যাত্রার উদ্ভব হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেব কাহিনী ছেড়ে মানুষ ধীরে ধীরে মানুষের কাহিনীর দিকে ঝুঁকতে লাগলো। ফলে মানবকাহিনী ও দেবকাহিনী মিলে রচিত হলো বিখ্যাত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক। 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অভিনয় করে প্রথম যে সখের দল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সেটা হল ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের দল। এরপর আরোও অনেকে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এদের মধ্যে প্যারীমোহন ও নবীনচন্দ্র বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। এই নবীনচন্দ্র বসুই প্রথম রঙ্গমঞ্চে উপযোগী আবহ শব্দ সৃষ্টি করে অভিনয়ে বাস্তবতা আনয়ন করেন, অন্যদিকে তিনিই প্রথম রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোকের ভূমিকায় স্ত্রীলোককে দিয়ে অভিনয় করান।

যাত্রাকে পরবর্তীকালে অপেরা নামেও জানা যায়। অপেরাতে একটি কাহিনী, নাটকের অঙ্ক, দৃশ্যবিভাগ, সবই ছিল। কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে এসব অভিনীত হত এবং সঙ্গীতের আধিক্য এর প্রধান লক্ষণ। নাট্যশালা স্থাপন ব্যয়সাধ্য হওয়াতে এইধরণের অপেরা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। যাত্রার জনপ্রিয়তার একটি অন্যতম প্রধান কারণ হলো ভক্তিরসাত্মক উপাখ্যান। আমাদের দেশের সাধারণ লোক ধর্মপ্রাণ, সেজন্য ধর্মভাবাপন্ন উপাখ্যান তাঁদের মর্মস্থলে আবেদন জানাতে পেরেছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এধরণের অপেরায় সংগীতের একটা বিশেষ স্থান ছিল। সংগীতের সুরে ভাববিহ্বল চিত্ত অধিকতর তন্ময় হয়ে যেতো। যাত্রাগান বা অপেরা আজও জনপ্রিয়তা হারায়নি, যন্ত্রচালিত সিনেমা, থিয়েটার তার আধুনিক প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও যাত্রার জনপ্রিয়তা গ্রামে গঞ্জে পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যায়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের রাজনৈতিক অরাজকতা, সামাজিক বিশৃংখলতা ইত্যাদির জন্যে কোনো স্থায়ী সাহিত্য সে সময় রচিত হতে পারেনি। ভারতচন্দ্রের পর সেজন্যে কোনো প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের কথা আমরা পাইনা। অথচ দেশের লোকের জীবন সাধারণ নিয়মের মধ্যেই চলছিল। তাদের জীবনের আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন তখন মিটিয়েছে কবিগান, পাঁচালী, টপ্পা, তর্জা, হাফ আখড়াই ইত্যাদি। এদের কবিদের মধ্যে কবিত্বশক্তি নাথকলেও দর্শককে টেনে আনার জন্য এরা অবাধে অশ্লীলতা ব্যবহার করেছিলেন। নিম্ন রুচিগ্রস্ত, দর্শকরা এতে পরিতৃপ্তি লাভ করলেও এসব বেশীদিন টিকে থাকেনি। একমাত্র টপ্পাতেই বিশেষ কোনো কুরুচিপূর্ণ ব্যবহার থাকতো না। বিশুদ্ধ মানবীয় প্রণয়, কখনও বা ভক্তিমূলক গানও টপ্পার ঢঙে গাওয়া হত। তবে টপ্পাকে বৈঠকী সঙ্গীত বা আখড়াই গান বলা হয়। যাত্রা বা কবিগানের মতো অনেক লোকের সামনে অভিনয়ের বা গাওয়ার ব্যাপার এখানে আসছে না।

যাই হওক, ইংরাজ প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাও রুচির সংস্পর্শে এসে দেশের লোকের রসবোধ ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে লাগলো। অশ্লীলতাকে বর্জন করে নাটকে মার্জিত রুচিকে গ্রহণের দিকে মানুষের আকর্ষণ দেখা গেল। সেই ইচ্ছাকেই পূরণ করলো Theatre বা নাটক। নাট্যশালা স্থাপন করে প্রথম যে নাট্যকার বাংলা নাটক অভিনয় করিয়েছিল তিনি হলেন রুশদেশবাসী হেরাসিম লেবেডেফ। তিনি 'বেঙ্গলী থিয়েটার' নামে একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন. এরপর ১৭৯৫ খৃঃতে Disguise নামে একটি নাটক ও ১৭৯৬ খৃঃতে Love is the

Best Doctor নামে একটি প্রহসনের বাংলা অনুবাদ করিয়ে বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সাহায্যে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অভিনয় করিয়েছিলেন। এর পূর্বে বেশ কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ ইংরাজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও ওগুলোতে কেবল ইংরাজী নাটকই অভিনীত হত। এরপর ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই বাঙালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। এখানে ইংরেজী নাটকও সংস্কৃত নাটকের ইংরাজী অনুবাদ অভিনীত হয়। এসব দেখে উৎসাহিত হয়ে ওরিয়েন্টেল সেমিনারীর ছাত্ররা ১৮৫৩ খৃতে "ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করে ইংরাজী নাটকের অভিনয় শুরু করে। বলা বাহুল্য এই দুটি নাট্যশালা বেশীদিন স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারেনি।

১৮৩৫ খৃঃতে শ্যাম বাজারের নবীন বসুর বাড়ীতে অভিনীত বিদ্যাসুন্দর নাটকই বাঙ্গালী অভিনীত প্রথম বাংলা নাটক। এরপর ১৮৫৭ খৃঃতে আশুতোষ দেবের বাড়ীতে নন্দকুমার রায়ের "শকুন্তলা" অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়তে লাগলো এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ, প্রতিষ্ঠিত হ'ল, এগুলির মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালা, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ইত্যাদি প্রধান। নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নাটক রচনা করে যারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন তাঁদের নাম ও তাঁদের রচিত নাটকের নাম উল্লেখ করা হল-

নাট্যকার	নাটক
জি.সি.গুপ্ত	*কীর্তিবিলাস (১৮৫২)*
তারাচরণ সিকদার	*ভদ্রার্জুন (১৮৫২)*
হরচন্দ্র ঘোষ	*ভানুমতী চিত্তবিলাস (১৮৫৩)*
	কৌরব বিয়োগ (১৮৫৮)
	চারুমুখ চিত্তহরা (১৮৬৪)
	রজতগিরি নন্দিনী (১৮৭৪)
কালীপ্রসন্ন সিংহ	*বাবু (প্রহসন)*
	বিক্রমোর্বশী (১৮৫৭)
	সাবিত্রী সত্যবান (১৮৫৮)
	মালতী মাধব (১৮৮৫)
উমেশ চন্দ্র মিত্র	*বিধবা বিবাহ নাটক (১৮৫৬)*
রামনারায়ণ তর্করত্ন	*কুলীন কুলসর্বস্ব (১৮৫৪)*
	নবনাটক (১৮৫৬)
	বেণী সংহার (১৮৫৩)
	রত্নাবলী (১৮৫৮)
	অভিজ্ঞান শকুন্তলম (১৮৬০)

মালতী মাধব (১৮৬৭)

পৌরাণিক নাটক- *রুক্মিণী হরণ (১৮৭২)*

কংসবধ (১৮৭৫)

ধর্মবিজয় (১৮৭৬)

প্রহসন- *যেমন কর্ম তেমন ফল*

চক্ষুদান

উভয় সংকট

রামনারায়ণ তর্করত্ন ছাড়া অন্যান্য নাট্যকারদের রচিত নাটকে কোনো নাট্যগুণ ছিলনা,অভিনয়ও খুব একটা আকর্ষণীয় হয়নি। এদের বেশীর ভাগই অনুবাদক নাট্যকার ছিলেন। যার ফলে কাহিনীর দিক দিয়ে মৌলিকতার দাবী তারা করতে পারেন না, তবে সার্থক বাংলা নাটক সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য অবশ্যই তারা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যেহেতু আমার আজকের আলোচনা রামনারায়ণ তর্করত্নের পূর্বপর্যন্ত, তাই রামনারায়ণ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করলাম না। তবে একটা কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে অভিনয়কে জনপ্রিয় করার জন্যে উপরোক্ত নাট্যকারদের সমসাময়িককালে নাটক রচনা করলেও রামনারায়ণ বেশ কয়েকখানি মঞ্চ সফল নাটক রচনা করেছিলেন এবং তার 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটক খানিই প্রথম নাটক যা অসাধারণ অভিনয় সাফল্য লাভ করেছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

বাংলা নাটকের ইতিহাস ঃ *ডঃ অজিতকুমার ঘোষ*

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড) ঃ *ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়*

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ঃ *ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়*

****

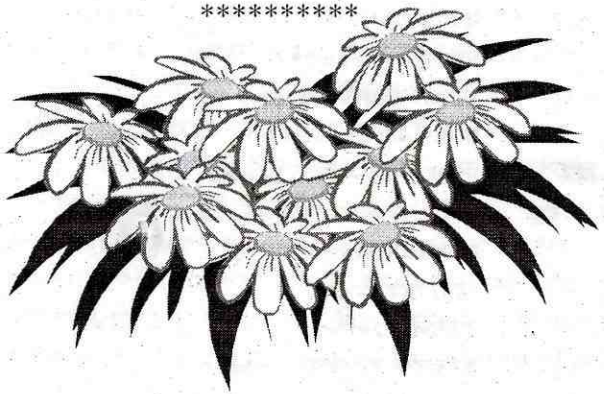

শারদীয় অনুভবের কিছু প্রাসঙ্গিকতা

শ্রীমাধব শর্মা

প্রবন্ধক, পরিচালনা সঞ্চালকের কার্য্যালয়।

আসাম ইলেক্ট্রিসিটি গ্রীড কর্পোরেশন লিমিটেড্।

বিজুলী ভবন, গুয়াহাটী-১

ছোটবেলায় ভোমরাজ নামের এক বিক্রেতার প্রতি বহুদিন পর্য্যন্ত আমি মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে ছিলাম। এতো বদমাইস ছিল, বহু ক্রেতার সামনে এক কোনে নিয়ে আমার হাফপেণ্ট খুলেকোমরের মাপ নিতো। পিতৃদেব ও ভোমরাজের প্ররোচনায় ছোটবেলায় কখনই মাপমত জামা কাপড় পরবার সুযোগ পাইনি। 'বাটার দোকানে জুতা কিনতে গিয়েছিলাম-নয়টাকা নিরানব্বৈ পয়সায় সুন্দর এক জোড়া জুতা, সঙ্গে দুই-চারটা বেলুন আর-একখানা মুখোশ-একেবারে বিনাপয়সায়! নতুন কাপড়ের গন্ধ, জুতার গন্ধ, এর সঙ্গে রাবার-রাবার গন্ধ-একমিশ্রিত গন্ধে শারদীয় অনুভব জাগ্রত করেছিল সে সময়ে।

আসলে বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিন থেকেই পূজো-পূজো ভাব এসে যেতো সে সময়। শেফালি ফুলগুলি গাছ থেকে নেমে এসে শিশিরে সিক্ত হয়ে 'পুত' হতো। রসঘন জম্বুরা তার মাঙ্গলিক সুবাসে চতুর্দিকে এক শারদীয় অনুভবের পরশ ছড়িয়ে দিত। শস্যক্ষেত্রে সুপুষ্ট শস্য রাশিও যেন নেচে-নেচে মাতৃবন্দনা গাইত। সমস্ত বসুন্ধরা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো, ভগবতীর আগমনকে সম্ভাষন জানাতে।

মহালয়ার কাকভোরে মানুষেরা শয্যাত্যাগ করে পথে বেড়িয়ে পড়তো কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত চণ্ডীপাঠ শুনতে। সেইদিন আবার মহালয়ার পার্বন-শ্রাদ্ধের দিন, হাজার-হাজার লোক নদীতে গিয়ে তর্পন করে। সাত-পুরুষ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও জ্ঞাত-অজ্ঞাত মৃত পরিজনদের জন্য তর্পন করা হয়। মহালয়ার ব্রহ্মমুহূর্তে দেবীর ত্রিনেত্রের অঙ্কনকার্য্য শুরু করা হয়। মহালয়ার পূর্বপক্ষকে 'প্রেতপক্ষ' বলা হয়, মহালয়ার পরের দিন থেকে নবরাত্রি আরম্ভ হয়ে যায়, ক্রমশঃ ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসে। আকাশ-বাতাস সর্বত্র যেন পূজো পূজো হয়ে ওঠে। মৃৎ-শিল্পীরাও রং ও তুলি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে- মৃন্ময়ী 'মা' কে স্বর্গের রূপ প্রদান করতে। বেলবরন ও নবপত্রিকার প্রবেশ হয় পূজামণ্ডপে। বেলগাছের গোড়া থেকে 'মা' কে বরন করে লৌকিকভাবে নিয়ে যাওয়া হয় পূজার বেদীতে, এমনভাবে, যেন মেয়ে আসছে মায়ের বাড়ী। পূজাস্থলীতে অগনন নারীকণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে ওঠে-

"আইস দুর্গাদেবী বইস বেলর তলে

চরম ধুয়াইবো ভৃঙ্গার জলে।।"..... (অসমিয়া 'দুর্গানাম')

যে ভাবে দেবীর নয়টি রূপের প্রতীক, সেভাবে মহাষ্টমীর দিনে প্রতিষ্ঠিত নয়টি ঘট

দেবীর নয়টি শক্তির প্রতীক, সেগুলি যথাক্রমেঃ-

নব পত্রিকা	নবঘট	নবদুর্গা
১। কলাগাছের পাতা ব্রাহ্মনী	১। উগ্রচণ্ডা	১। শৈলপুত্রী
২। কচুগাছের পাতা কালিকা	২। প্রচণ্ডা	২। ব্রহ্মাচারিনী
৩। হলুদের পাতা দুর্গা	৩। চান্ডোগ্রা	৩। চন্দ্রঘন্টা
৪। জয়ন্তীগাছের পাতা কার্ত্তিকী	৪। চণ্ডনায়িকা	৪। কুষ্মাণ্ডা
৫। বেলগাছের পাতা শিবা	৫। চণ্ডা	৫। স্কন্দমাতা
৬। দাড়িম গাছের পাতা রক্তদণ্ডিকা	৬। চণ্ডবতী	৬। কাত্যায়নী
৭। অশোক গাছের পাতা শোকরহিতা	৭। চণ্ডরূপা	৭। কালরাত্রি
৮। মানকচুর পাতা চামুণ্ডা	৮। অতিচণ্ডিকা	৮। মহাগৌরী
৯। ধানগাছ লক্ষ্মী	৯। রুদ্রচণ্ডী	৯। সিদ্ধিদাত্রী

মহা আয়োজন, মহা আড়ম্বর এবং মহোৎসবে পালিত এই পূজোৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'দুর্গা'র মূল সম্পর্কে বলা এক দুরূহ কাজ। দেবী মাহাত্ম্য বর্নিত শ্রীশ্রীচণ্ডী, দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরান, কালিকাপুরান, মহাভারত, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরান, দেবীপুরান আদির মাধ্যমে দেবীকে খুঁজে পাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সামান্য পঢ়া-শুনা, স্বল্প জ্ঞান, মাঝে মধ্যে ধর্মালোচনার কিছুটা শ্রবনকে সারথি করে দেখা যাক, 'মা'র মাহাত্ম্য এবং তারসঙ্গে কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা। এজন্য তিনটি উপাখ্যানের সাহায্য নিতে হলো-

মেদিনী নামের উৎপত্তি ঃ মার্কণ্ডেয় এবং দেবী ভাগবতের মতে, প্রলয়কালে ব্রহ্মার দিবা অবসানের সময় সমগ্র বিশ্ব সমুদ্রে পরিনত হলো। ভগবান বিষ্ণু অনন্ত নাগকে আশ্রয় করে অনন্ত শয্যায় নিমগ্ন, তাঁর নাভিমণ্ডল থেকে একটি সুন্দর পদ্মের উৎপত্তি হলো আর তার ওপরে ব্রহ্মা উপবিষ্ট। এইভাবে বহুকাল যাবার পর বিষ্ণুর কাণের ময়লা থেকে দুজন দৈত্য মধু ও কৈটভের আবির্ভাব হলো। দৈত্যরা নিজেদের উৎপত্তি ও প্রলয় প্লাবিত জলরাশির সৃষ্টিকর্তা কে তার উৎস জানতে চাইল এবং এরদ্বারাই এদের চিন্তাশক্তি বা বোধশক্তি জাগ্রত হলো। এই বোধিলাভে সমর্থ হওয়ায়, আকাশ মার্গ থেকে এক বাগ্‌বীজ মন্ত্র ধ্বনিত হলো। অসুরেরা এই বীজমন্ত্র জপ করে মালা-পুস্তক-পাশাঙ্কুশ ধারিনী দেবী সরস্বতীর সাক্ষাৎ লাভ ও ইচ্ছামৃত্যুর বর লাভ করে। অসুরেরা তাদের বিশাল বপু নিয়ে জলচর জীবদের সঙ্গে জলক্রীড়ায় মগ্ন হলো। এইভাবে কিছুদিন যাবার পর তাদের মনে এক কু-অভিসন্ধি জেগে উঠলো। ব্রহ্মাকে হত্যা করে উক্ত পদ্মফুলের উপর উপবিষ্ট হবার বাসনা। ব্রহ্মা ধ্যানে এ ব্যাপারে জানতে পেরে বিষ্ণুকে জাগরিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? বিষ্ণুযে অনন্ত শয্যায়। এইসময়ে আকাশমার্গে দৈববানী শোনা গেল। ব্রহ্মা শুনলেন, 'তুমি মহামায়ার ধ্যান কর।' ব্রহ্মা দেবীস্তুতিতে নিমজ্জিত হলেন, তথাঃ-

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বংহি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।।
(শ্রীশ্রীচণ্ডী-মধুকৈটভ বধ ঃ ৬৬-৮২)

ব্রহ্মার স্তুতিতে যোগনিদ্রাস্বরূপিনী মহামায়া বিষ্ণুর দেহ থেকে নির্গত হলে বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গ হলো। ব্রহ্মাকে আক্রমনের জন্য উদ্যত দৈত্যদের সঙ্গে বিষ্ণুর প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। পাঁচহাজার বছর ধরে এই যুদ্ধ চললো। কারো হার-জিত হলো না। এই সময় ভগবতী মহামায়ার রূপ ধারন করে অসুরদ্বয়ের শরীরে প্রবেশ করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মতিভ্রষ্ট হলো। তারা বিষ্ণুকে বরদিতে চাইল। বিষ্ণু বললেন, 'আমার হাতে তোমাদের মৃত্যু হোক।' অসুরেরা বলল- 'তাই হবে, কিন্তু জলে আমাদের মৃত্যু হবেনা কখনো।' বিষ্ণু তাঁর বিশাল উরুদ্বয়ের উপর মধুকৈটভকে তুলে ধরে চক্রের দ্বারা তাদের শিরচ্ছেদ করলেন। মধুকৈটভের বিশাল শরীর দুটি জলে নিমজ্জিত হয়ে গেল, কিন্তু তাদের দেহের মেদযুক্ত অংশগুলি জলের উপর ভাসতে থাকলো। যে অংশগুলি জলের উপর রইল, তা পরবর্তীকালে স্থলভাগে পরিনত হল। মেদ থেকে স্থলভাগের উৎপত্তি, সেইজন্য ভূমণ্ডলের আরেক নাম 'মেদিনী।'

স্যমন্তক মনির উদ্ধার প্রসঙ্গ- রবিদেবতার পরম বন্ধু সত্রাজিৎ, তিনি বন্ধু সত্রাজিৎকে কোনো এক সময় মহামূল্যবান মনি উপহার দিয়েছিলেন। মনির একটা বিশেষত্ব ছিল, যিনি সেটা ধারন করবেন, তার মারি-মড়ক, অভাব ইত্যাদি কিছু থাকবে না। শ্রীকৃষ্ণ মনি পরিধান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, সত্রাজিৎ তাঁর অনুরোধ ফিরিয়ে দেন। এর কিছুদিন পর সত্রাজিতের ভাই প্রসেন মনিটি ধারন করে শিকারে যায়। এক সিংহের সঙ্গে তার ভীষন যুদ্ধ হয়, সিংহের বিক্রমে প্রসেন পরাভূত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সিংহ মনিটা নিয়ে চলে যায়। কিন্তু সিংহ মনি নিয়ে যাবার পথে মুখামুখি হয় স্মক্ষরাজ জাম্বুবন্তের সামনে, স্মক্ষরাজ সিংহকে বধ করে মনি নিয়ে গর্তে প্রবেশ করে। প্রসেনের মৃত্যুও স্যমন্তক মনি হারানোতে সত্রাজিৎ সন্দিহান হয়ে উঠেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে এই ঘটনার নায়ক বলে মনে করলেন এবং দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কলঙ্ক মোচনের থেকে মুক্তি পাবার প্রয়াসে জাম্বুবন্তের গর্তে প্রবেশ করে স্যমন্তক মনি ফিরিয়ে দিতে বলেন। জাম্বুবান শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইল। আঠাইশ দিন ধরে তুমুল যুদ্ধ চলল- কারো হার-জিত নেই। এদিকে দ্বারকাবাসী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাবর্ত্তন না করায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারা সত্রাজিতকে দোষী সাব্যস্ত করে, শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় বলি বিধান সহকারে দুর্গা পূজা করেন। দেবী দুর্গার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মনি ও জাম্বুবানের কন্যা সত্যভামাকে বিবাহ করে দ্বারকায় ফিরে এলেন। শঙ্করদেব বিরচিত 'কীর্ত্তন-ঘোষা'য় এইভাবে বর্নিত আছে-

পাছে যদুবংশ যতেক আছে।
কৃষ্ণ আসন্তোক মনত বাঞ্চে।।
যার যেন শক্য পরিলা মানে
পূজিলা দুর্গাক বলি-বিধানে।। ৫৩
পঢ়ি স্তুতি স্তোত্র করে মঙ্গল।
সিটো আশীর্বাদ ভৈল সাম্ফল।। ৫৪
ভার্য্যায়ে সহিতে আসিলা হরি।
গ্রীবাত স্যমন্ত-মনিক ধরি।। (পৃ ঃত৭২)

ব্রজকুমারীদের কাত্যায়নী ব্রত ঃ-

দ্বাপর যুগে কৃষ্ণপ্রাণা গোপীনীরা কৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার আশায় একমাসব্যাপী কাত্যায়নীব্রত পালন করেছিলেন। তারা ভদ্রকালী দেবী দুর্গার পূজাও করেছিলেন। এরফলে মায়ের কৃপায়, বস্ত্রহরন লীলা পর্বে তাদের কৃষ্ণদর্শন হয়েছিল এবং পরবর্তী রাসলীলায় গোপীনীদের মনোবাঞ্ছাও পূর্ন হয়-

"কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্যধিশ্বরী।
নন্দগোপং সুতং দেহি পতিংমে কুরুতে নম ঃ।।
এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য ঃ কৃষ্ণ চেতস ঃ।
ভদ্রকালীং সমানচ্চ ভুয়ামন্দসুত ঃ পতি।।" (ভাগবত)

ব্রজকুমারীরা জানতেন মহাশক্তির কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণকে লাভ করা সম্ভব নয়, অতত্রব তারা হেমন্তকালে যমুনার বালিতে কষ্টসাধ্য উপাসনার দ্বারা দেবী-দুর্গাকে আরাধনা করেছিলেন।

উপরোক্ত তিনটি উপাখ্যান থেকে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত কার্যের অন্তরালে এক মহাশক্তি নিহিত হয়ে আছে। আগুনের দাহিকা শক্তি আছে, কিন্তু দাহিকা শক্তি ছাড়া আগুনের অবস্থা সুপ্ত। মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, কাণ দিয়ে শোনে-এইক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি অথবা শ্রবণশক্তির দ্বারা দর্শন বা শ্রবণকার্য্য সম্পাদিত হয়, চোখ বা কাণ দিয়ে নয়।

নারদপঞ্চরাত্রের শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে দেবীদুর্গা মহাবিষ্ণু রূপে আখ্যায়িতা, তাঁকে পরমাশক্তিও বলা হয়েছে আর তাঁকে জানলেই পরম পুরুষ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পাওয়া সম্ভব বলে বলা হয়েছে। অন্যথা সেই জ্ঞান-ব্যতিরেকে ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভব নয়।

ভগবান বিষ্ণু অথবা শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার কার্য্যক্রমনিকার অন্তরালে এই মহাশক্তির অস্তিত্ব অনুভূত হয়। এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক যেন একটি মুদ্রার দুইটি পিঠ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর অন্তর্গত শুম্ভ-নিশুম্ভ বধে সন্নিবিষ্ট একাদশ অধ্যায়ে 'নারায়নী স্তোত্রে' বলা হয়েছে-

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীত পরমায়ুধে।
প্রসীদবৈষ্ণবীরূপে নারায়নি নমোহস্তুতে।। ১৬
গৃহীতোগ্রমহাচক্রেঃ দংস্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরেঃ।
বরাহরূপিনি শিবে নারায়নিঃ নমোহস্তুতে ।। ১৭
নৃসিংহরূপেনোগ্রেন হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রানসহিতে নারায়নি ঃ নমোহস্তুতে।। ১৮

উক্ত তিনটি শ্লোকে দেবীকে বিষ্ণুশক্তি স্বরূপিনী বলা হয়েছে। দন্তের দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলনকারিনী 'বরাহরূপিনী' অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর 'বরাহ অবতারে'র কথাই সূচিত করা হয়েছে। যেভাবে দেবীকে 'নৃসিংহরূপিনী' বলে আখ্যা দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর 'নরসিংহ অবতারে'র কথা বলা হয়েছে।

আবার দেবীর 'আদ্যাস্তোত্র'টিতে আমরা দেখি ঃ

'দক্ষ্যস্য দুহিতা দেবী দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশিনী।
রামস্য জানকী ত্বং হি রাবনধ্বংসকারিনী।।
চণ্ড-মুণ্ড বধে দেবী রক্তবীজ-বিনাশিনী।
নিশুম্ভ-শুম্ভ--মধনী মধুকৈটভ ঘাতিনী।।

এখানে দেবীকে জানকী অর্থাৎ সীতাকে রাবন ধ্বংসকারিনী ও মধু-কৈটভ ঘাতিনী বলা হয়েছে। অতত্রব দেবী ভগবান বিষ্ণুর উপরোক্ত অবতার সমূহের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি। এইভাবে স্বর্ণলঙ্কা ও রাবন বিধ্বংসী অবতারী রামেরও অন্তর্নিহিত শক্তি একমাত্র এই দেবীশক্তি। সুতরাং দেবী প্রসন্না হলেই তিনি ভক্তদের বিষ্ণুমার্গের সন্ধান দিতে পারেন। সেইজন্য দেবীকে 'স্বর্গমুক্তি প্রদায়িনী' বলা হয়। এই মর্মে একটি শ্লোক উপস্থাপন করা যেতে পারে-

"আরাধিতা মৈব দুর্গা ভোগস্বর্গপবর্গদা,
মৈষা প্রসন্না বরদা নৃনাং ভবতি মুক্তয়ে।।"

মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগন দেবী পূজা ব্যতিরেকেও সমগ্র মাতৃজাতির, নারীদের অগ্রস্থান দিয়ে পূজার নিয়ম প্রতিস্থাপন করলেন।

'অগ্রতো মাতর ঃ পূজ্যা পিতৃনাং তদন্তরম্ ' (স্মৃতি)

আবার মনুসিংহাতেই বলা হয়েছে যে, যে ঘরে বা বংশে নারীগন সম্মানিতা বা পূজিতা, সে ঘরে বা বংশের প্রতি দেবতারাও প্রসন্ন থাকেন-

'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্রদেবতা।' (মনুসংহিতা)

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, 'দেবতা' শব্দটি সংস্কৃতে 'স্ত্রীলিঙ্গ' বাচক কিন্তু এর দ্বারা দেব দেবী দুইকেই বোঝানো হয়। আমাদের দেশ প্রাচীনকাল পর্য্যন্ত মাতৃপ্রধান দেশ বলে প্রখ্যাত। সেইজন্য আমরা ভারতবর্ষকে ভারতমাতা বলে বন্দনা করি।

সমস্ত পুংলিঙ্গ জীবকে শিবের অংশ এবং স্ত্রীলিঙ্গ জীবকে দেবীর অংশ বলে বলা হয়। গনেশ তার বাল্যকালে একদিন একটি স্ত্রী-বিড়ালকে প্রহার করে। কিছুক্ষন পর মায়ের কাছে কিছু আবদার করতে গিয়ে মা পার্বতীর অবস্থা দেখে চিৎকার করে উঠে, মাকে জিজ্ঞাসা করে যে- 'কে তোমার এই অবস্থা করল?' পার্বতী উত্তরে বলেন-'বাবা, তুমি যে বিড়ালটিকে প্রহার করেছিল তারই দাগ এগুলি। কারন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডতে সমূহ স্ত্রী-জীবই আমার অংশস্বরূপ।'

লৌকিকভাবে আমাদের সমাজকে অনুবীক্ষিত করলে এই মাতৃশক্তির কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। উদাহরনস্বরূপ বলা যেতে পারে, একজন বিধবা মাতৃ তার দুগ্ধ-পোষ্য সন্তানদের যেভাবে মানুষ করে তুলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন, হয়তো মাতৃশক্তির জোরেই তা সম্ভব হয়। সেজন্যই এতদ্ মাতৃশক্তিও দেবীর পূজ্য।

এই দেবী মহাশক্তিকে কি ভাবে পূজাপোসনা করা যায়? দেবীর 'অর্গলা স্তোত্র' টি ছেলেমেয়েদের শিশুকাল থেকে শেখাতে পারলে ভাল। যথা-

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি।।

'নারায়নী স্তোত্রে'র অন্তর্গত ১০ নং থেকে ১২ নং শ্লোক তিনটি কণ্ঠস্থ থাকলে ভাল, এ সকল দেবী মন্দিরের প্রণাম মন্ত্র। যথা-

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়নি নমোহস্তুতে।। ১০

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুনাশ্রয়ে গুনময়ে নারায়নিঃ নমোহস্তুতে।।১১

শরনাগতদীনার্ত্ত পরিত্রানপরায়নে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবী নারায়নি নমোহস্তুতে।। ১২

তেরটা অধ্যায়ের ৫৭৮ শ্লোক এবং ৭০০ টি মন্ত্রের শ্রীশ্রী চণ্ডীপাঠ করা সহজ কাজ নয়। দেবীর তাত্ত্বিক দিক অধ্যয়ন করে দেবীশক্তি জাগরিত করা সহজ কাজ নয়। দেবীশক্তিকে জাগরিত করার জন্য লোকাচার দ্বারা প্রচলিত আচার-আচরন ও বিধি পালন করতে পারলেই হয়তো কার্য্যসিদ্ধি সম্ভব হবে। অধিক অধ্যয়ন সাধারন মানুষের মনে কেবল মাত্র জটিলতা বৃদ্ধি করতে পারে। যেমন একেশ্বরবাদ সাধারন মানুষের কাছে বোধগম্য হওয়া কঠিন। সুতরাং ভক্তিমার্গই হলো প্রকৃতপথ। ভক্ত প্রহ্লাদ ও রামভক্ত হনুমানের ভক্তিমার্গের কাহিনী সর্বজনবিদিত।

এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের আবাস স্থান। তিনি সব জায়গায় আছেন সত্যি, কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে বিশেষরূপে থাকেন'। সেইজন্য লোকাচার দ্বারা প্রচলিত আচার-আচরন ও বিধিপালন দ্বারা দেবীভক্তি জাগরিত করা যায়। ভোরবেলা ও সন্ধ্যাবেলা কিছুটা সময় বৈষয়িক ভাবমুক্ত হয়ে দেবীকে স্মরন করলেই হয়তো মনের কলুষতা অনেক গুনে হ্রাস পাবে এবং এর ফলে এক সুস্থ সমাজের গঠন হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় নারী শক্তির প্রতি সদা সচেতন ছিলেন। শোনা যায় শিকাগোতে ভ্রমনকালে কয়েকজন আমেরিকান মহিলা সাংবাদিক স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভারতীয় মহিলাগন কোন কোন ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন। উত্তরে স্বামীজী জানান, 'রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করার দক্ষতা অর্জন করেছেন ভারতীয় নারী।' সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করে, কে সেই নারী? স্বামীজী বললেন 'বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।'

সত্যযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত এই হল নারী শক্তি। তৎসত্ত্বেও বর্তমান কালে নাবালিকা ধর্ষন, নারী বলাৎকার, যৌতুকের বলি ইত্যাদি নানারকমের অমানুষিক কার্য সংঘটিত হয়ে আসছে। এইধরনের দুষ্কার্য্য ভারতীয় পরম্পরার উপর আঘাত হানছে। দেবী দুর্গার প্রতি এই প্রার্থনা রইল, যাতে তিনি সমস্ত অশুভ শক্তি ও কার্যের অবসান ঘটিয়ে সবাইকে নৈতিকতা প্রদান করেন।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। দুর্গা-রূপে রূপান্তরে ঃ *শ্রীমতী পূর্বা সেনগুপ্তা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলিকতা-৭৩*

২। শ্রীশ্রীচণ্ডী ঃ *নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত ও সুবোধ চন্দ্র মজুমদার, কর্তৃক সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকতা-৯*

৩। আদি ও আসল স্তব কবচমালা ঃ *সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এনবসাক ৩/২ শ্যামচরন দেষ্ট্রীট, কলিকতা-৭৩*

৪। মনুসংহিতা (অসমীয়া অনুবাদ) ঃ *শ্রীহরকান্ত শর্মা, প্রকাশক ঃ শ্রীরাতুল শর্মা ও শ্রীরমনী শর্মা চান্দমারী, তেজপুর।*

৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ঃ *রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, গুয়াহাটী।*

(বিঃদ্রঃ-প্রবন্ধটি ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬ সালের 'রবিবারের আলোচনা' সংখ্যা, আজির অসমে প্রকাশিত হয় আর এটি তার বঙ্গানুবাদ)

****

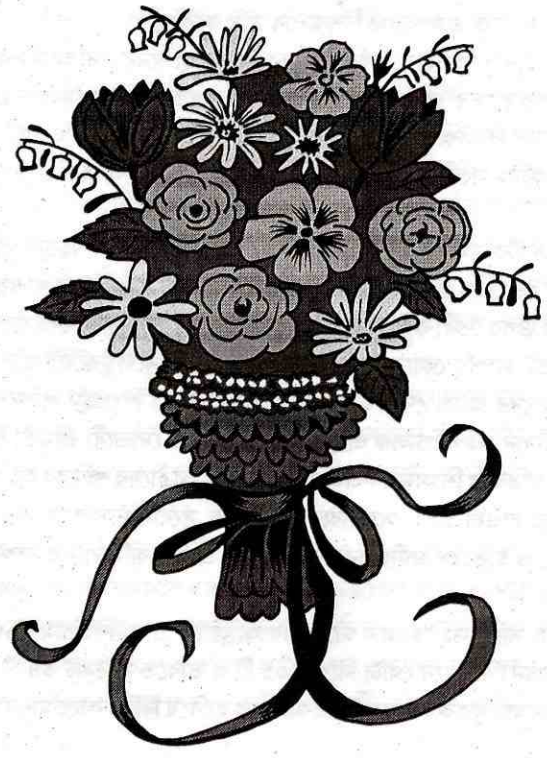

আমাদের আত্মাদের রক্ষা কর

সুনন্দা দাস
বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ

মানুষকে নিয়েই সমাজ আর সমাজের জন্যই মানুষ। সব মানুষেরই এই পৃথিবীতে সুস্থ, স্বাভাবিক ও সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। কিন্তু এই একবিংশ শতিকার বৈদ্যুতিকযুগে এসেও আমাদের এই তথাকথিত সভ্য সমাজে সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকবার জন্য বহুপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়ে যাছে। আজও বহুকোটি মানুষ অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাবে প্রতিদিন প্রতিমূহুর্তে প্রাণপণযুদ্ধ করছে। এছাড়াও লড়াই চলছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও নানা বিষময় পরিবেশের বিরুদ্ধে। এরফলে কত পরিবার বিছিন্ন হয়ে পড়ছে, কত অসহায়, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিছে সমাজ। এই সমস্ত শিশুদের ভবিষ্যৎ কি? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ও ধরণের শিশুরা সমাজে থেকেও তারা ন্যূনতম প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত। সমাজের তাদের প্রতি কোনো ধরণের দায়িত্ব থাকে না, ফলে এই সমস্ত অবহেলিত, অনাহুত শিশুরা সমাজে একধরণের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে থাকে।

এই অবাঞ্চিত, অসহায়, দুর্গত শিশুদের পুনরসংস্থাপনের জন্য আজ সরকার, বেসরকারী সংস্থা, বহুপরিবার তাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হাত বাড়িয়েছে। পরিবার পরিজন থেকে বিছিন্ন হয়ে পরা শিশুও বালক-বালিকাদের নিয়ে তৈরী হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ছোটছোট সমাজের। এধরণের এক কৃত্রিম সংস্থা বা সমাজে যাবার সুযোগ ঘটেছিল আমার ২০০৩ সালের ২২ শে অক্টোবর।

প্রতিষ্ঠানটির নাম SOS (Save our soul), গুয়াহাটী শহরের পশ্চিমে আজরাতে এই শিশুগ্রামটি তৈরী হয় ১৯৮৯ সালে। গোপীনাথ বরদলৈ বিমান বন্দর পাওয়ার একটু আগেই ২৫ বিঘা জমির উপর তৈরী করা হয়েছে এই কৃত্রিম গ্রামের। উচু পাকা দেওয়ালের বাইরে থেকে ভেতরের জগতটা সম্পর্ক কোনো ধারণাই করা যায়না। গেট খুলে ঢুকলেই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার কার্যালয়। আমাদের আগে থেকেই অনুমতি নেওয়া ছিল। শিশুগ্রাম পরিদর্শন করাবার ভার সেদিন নিয়েছিলেন সহপরিচালক শ্রীযুক্ত সুবোধ দাস ও দোভাষী শ্রীমতী চিত্রলেখা। বাংলা বিভাগ থেকে প্রতিবছর শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের শহরের আশে পাশের কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়। সহপরিচালক শ্রীযুক্ত সুবোধ দাস আমাদের প্রথমে শিশুগ্রাম সম্পর্কীয় তথ্য ও ইতিহাস জানালেন যাতে গ্রাম ও গ্রামের বাসিন্দাদের সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরী করা যায়।

১৯৪৯ সালে ডঃ হেরমান গমেইনার অষ্ট্রিয়াতে প্রথম শিশুগ্রাম (SOS Village) এর প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে গোটা বিশ্বে ১৩১ টি ও ভারতে সর্বমোট ৩৪ টি শিশুগ্রাম স্থাপিত হয়েছে। ডঃহেরমান খুব কম বয়সে পিতা-মাতাকে হারিয়ে দিদির কাছে মানুষ হন। তাই হয়তো

অনাথ শিশুদের প্রতি ছিল তাঁর অসীম মায়া। তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে তিনি রাস্তা থেকে অনাথ শিশুদের তুলে এনে বাড়ীতে পরিবারের সদস্য হিসাবে প্রতিপালন করতেন। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতেন পরিচারিকরা, তারপর ধীরে ধীরে গৃহের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে শিশুদের আশ্রয় ও সংস্থাপনের জন্যে জন্ম হ'ল শিশুগ্রামের। শিশুগ্রাম স্বয়ংসেবী সংস্থা। সরাসরি ভাবে সরকার বা সরকারী ভাবে এরা কোনো সাহায্য গ্রহণ করেন না। জনসাধারণ (দেশী, বিশেষভাবে বিদেশী) থেকে অনুদান যথেষ্ট পরিমানে আসে। শুধুমাত্র আইনগত ব্যাপারে সরকারী সাহায্য গ্রহন করা হয়।

শিশু গ্রামের রীতি অনুযায়ী শিশুদের এক একটি পরিবারে একজন মায়ের তত্ত্বাবধানে সংস্থাপিত করা হয়। গর্ভধারিণী মায়েদের মত তারা এদের সকাল থেকে সন্ধ্যা, দিন-মাস-বছর ধরে প্রতিপালন করেন। সচক্ষে প্রত্যক্ষ না করলে এদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা বোঝানো সম্ভব নয়। শিশুদের সকলের পিতা একজন তিনি হলেন গ্রামের অধিকর্তা (Director)। আমাদের দুর্ভাগ্য সেদিন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। আজরার শিশুগ্রামে ১৬ জন মায়ের স্নেহছায়ায় শিশুরা প্রতিপালিত হছে। এই সমস্ত পরিবারের সর্বময় কর্তা হলেন গ্রামের অধিকর্তা। প্রতিটি পরিবারের জন্য গৃহ আছে। গৃহসমূহকে বিভিন্ন নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন- নীলকণ্ঠ, সুবর্ণরেখা, মানসপ্রতীম, মালঞ্চলতা,নিশিগন্ধা ইত্যাদি নামে। এই নামের ভিত্তিতেই তাদের পরিবারের সনাক্ত করা হয়। প্রতিটি ঘরে বসার ঘর, শোবার ঘর, রান্না ও খাবার ঘর, এছাড়াও একটি পরিবারে থাকা বাঞ্চনীয় সমস্ত সামগ্রীই আছে।

শিশু গ্রামের সদস্য হবার দিন থেকেই এদের দেখা শোনার সমস্ত দায়িত্ব গ্রামই বহন করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক একজন সদস্য স্বাবলম্বী হয়ে না ওঠে। মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ে না হয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত মায়ের সঙ্গে থাকাটাই বাধ্যতামূলক, তবে অবস্থাবিশেষে অন্যথা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল, অসহায়, দুর্বল শিশুদের সুস্থ জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করা। শিশুগ্রামের বাসিন্দা শিশুদের যত্ন সহকারে নির্দ্দিষ্ট রীতিনীতি অনুসারে লালন-পালন করা হয়, যাতে তারা চারদেওয়ালের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে দুই পা মিলিয়ে চলতে পারে। সেই সঙ্গে সফল নাগরিক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এখানকার শিক্ষার মূল সূত্র হলো বাইরের জগতটাই তার আসল জায়গা, এই চিন্তা জাগিয়ে দেওয়া।

শিশুরা প্রথমাবস্থায় পরিবারে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। পরে মেধা অনুযায়ী ছেলে মেয়েদের শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জনের জন্য পাঠানো হয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষাও দেওয়া হয়। আমাদের এখানে দেখা সবচাইতে ছোট শিশুটি হ'ল ৬ মাসের এবং সবচাইতে বড়টি ১৮ বৎসর বয়সের।

এখানকার বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যলাভ করার কথা আমাদের জানালেন শ্রীযুক্ত সুবোধ দাস। তিনি ও চিত্রলেখা আমাদের পরিদর্শনে আগাগোড়া সঙ্গে ছিলেন। এরা থাকাতে আমরা সমস্ত খুঁটিনাটি জিনিষ ও তথ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞাত হই। এখানে যে কয়টি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তারাও আমাদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করেন। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর এক ছাত্রী এই শিশু গ্রামের বাসিন্দা। মেয়েটি

খুব ভালো ক্রীড়বিদ, জাতীয় স্তরে ও দুবার প্রতিনিধিত্ব করেছে।

এই গ্রামের কর্তৃপক্ষ আরো একটি গুরুদায়িত্ব বহন করছেন, আশে পাশের গ্রামের শিশু দের শিক্ষার ক্ষেত্রে। তাদের পড়াশুনার সাথে সাথে মধ্যাহ্ন আহারও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

অতি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে, সুচারুরূপে আন্তরিকতার সঙ্গে এর সমস্ত কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাছেন। আমরা ঘন্টা চারেক এদের সঙ্গে থেকে যে অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরিয়ে এনেছি তা জীবনের সঞ্চয়ের ঘরের বিরাট মূল্যবান সম্পদ হয়ে রইল।

ডঃ হেরমান ১৯৮৬ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বপর্য্যন্ত তিনি গোটা বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন এই শিশুগ্রামের প্রয়োজনীয়তা।

****

তেমনটা আর দেখিনা

রঞ্জনা সেন
বিভাগীয় প্রধান
অর্থনীতি বিভাগ

মা মাসিদের আড্ডা, ফেরিওয়ালার ডাক, রোদে ব'সে চুল বাঁধা বা উল বোনা, ও বাড়ীতে কি রান্না হ'ল তার খবর নেওয়া, মা-ঠাকুমার ছাদেঁ বসে বড়ি দেওয়া, সেই আত্মমগ্নতা, নির্ভেজাল আড্ডা- এখন তেমনটা আর কিছুই পাইনা । তবুও আজকের প্রবীনাদের মুখে চোখে কথাবার্তায় এখনও যে স্নিগ্ধতা ও শান্তি লক্ষ্য করা যায় যা কোন দেশবিদেশের বিশেষত্ব নয়, যুগবিশেষের বিশেষত্ব।

প্রশস্ত গৃহাঙ্গনে এঁদের বাল্যকাল কেটেছে, যন্ত্রমুখর জীবন-সংগ্রামে জীবিকার জন্য এঁরা প্রানপণ করেননি। পাঁচজনকে খাইয়ে খুশি করেই এঁদের তৃপ্তি। জগতের সামান্যই এঁরা জানেন ও একটি কোণেই এঁদের স্থিতি। উদ্যানলতার ভঙ্গি এদেঁর স্বভাবে ও উদ্যান-পুষ্পের সুরভি এঁদের আচরনে, এঁরা স্বতন্ত্রা নারী নন্। এঁরা কল্যানী নারী। তবে অস্তগামী চন্দ্রের স্নিগ্ধতারও দিন শেষ হতে চলল। সময়ের স্রোতে সত্যিকারের কল্যানী নারী হারিয়ে যাচ্ছে, একদিন হয়তো তাঁদের পাওয়া যাবে জাদুঘরে।

এরপর দেখি একবিংশ শতাব্দীর স্বতন্ত্রা নারীর প্রখর জ্বালা, লাবন্যহীন, পিপাসাময়, দুঃসাহসিক অরুনরাগ।

এঁরা অর্থাৎ পরবর্তিনীরা ফ্ল্যাটে বা বোর্ডিং হাউসে থাকা সাবধানী পিতামাতার হয়তো একমাত্র সন্তান। নিত্যসন্তোষ, নিস্পৃহত্ব ও অচাপল্যও, যা মা-ঠাকুমার কাছে শ্রেয় ছিল এঁদের কাছে তা মূল্যহীন। প্রিয়জনের সঙ্গে প্রাত্যহিক দান-প্রতিদান, কলহ-মিলনে যে শিক্ষা, তা বোর্ডিং হাউসে থেকে এঁদের হয়না। এঁদের জীবিকার টানে আধুনিক সভ্যতার বেড়াজালে হরিনীর মত ছট্‌ফট্ করতে হয়, তাই স্বভাবতই এঁদের স্বভাবে আসে বন্যতা, আচরনে আসে ব্যস্ততা। বিবাহের পিড়িতে বসবার সৌভাগ্য ঘটলেও নীরব নিভৃত জীবনে এঁদের মন বসেনা, মন চায় মত্ততা।

আধুনিক সভ্যতার সর্বঘটে বিদ্যমান দেখি যে নারীকে, সে এই স্বতন্ত্রা নারী- পক্ষপাতহীন, গৃহহীন, জনহিতপরায়ন, সামাজিক কর্তব্যে অটল। শিক্ষয়িত্রী হিসাবে, ম্যানেজমেণ্টে, সচিব হিসাবে, শিল্পীরূপে এ নারী নিখুঁত।

এই নারী সর্বপুরুষের সহকর্মিনী, কোনো একজনের রানী বা দাসী নয়, সকলের সন্মানের পাত্রী। এঁরাও নারী তবে গৃহিনী নন। এঁদের মধ্যে তেমনটা আর পাই না, না পাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। মন্দ-ভালয়, স্যাদা-কালোয় জীবন বয়ে চলেছে। মন খারাপ হ'লেও সামনের দিকে তাকাতে তো হবে। পেছনের দিকে তাকালে আর এগোনো যাবে না।

****

রুট নং-৬

রাজীব সাহা
বাংলা বিভাগ

নতুন জায়গা, পরিবেশ নতুন হলেও আশে-পাশের সকলেই বেশ সহৃদয় । কয়েক দিনেই বেশ আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। সম্পর্কের মালা যেন একটু করে আবার তৈরী হচ্ছে। ঠিক যেভাবে গড়ে উঠেছিল হোস্টেলে। দীর্ঘ দুবছর সেখানে কী করে কেটে গেলো তা বোঝাই গেলো না।

বাড়ীর বাইরে বহু দিন থাকায় বুঝেছি সম্পর্কের টান। প্রতিনিয়ত পরিবারের প্রতিজনই আপন স্নেহ ডোরে আকর্ষণ করছিল। কখনো ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে অনায়াস ধারাও বয়ে চলতো। উপায় ছিল না, অবশেষে সেভাবেই সিক্ত আবেগে ভাটা পরতো, জোয়ার শেষে পুনরায় অবিচল দৃঢ়, শক্ত শৈলতটের ন্যায় লক্ষ্য প্রকাশ পেতো, যাত্রা চলেছে আবার। সহপাঠীরাই পরিবারের এক একটি স্নেহমূর্ত্তির ভূমিকা পালন করেছে। ভাই বোনের স্নেহ, পিতার আদর আর 'মা'!! মায়ের হাতের স্বাদ, আদর-যত্ন, মায়ের অর্ধসিক্ত আঁচল, মুখে খিলি পানের গন্ধ....., সে সব পুরোটা পাওয়া না গেলেও কষ্টের লাঘব খানিক হতো।

'হোস্টেল জীবন' ছিল স্বপ্ন দেখার আনন্দময় অনুভূতি-যেন সমাজ বহির্ভূত কোনো পরিবেশ-ছিল সদ্যজাত শিশুটির ন্যায় জটিলতা পঙ্কিলতা মুক্ত আবহাওয়া।

সে যাক্‌গে----

নতুন চাকরির সঙ্গে এবার নতুন পরিবেশ। বাস্তবের সঙ্গে এবার তাল মেলাবার পালা। শহর থেকে একটু বাইরেই নির্ধারিত বিনিময়ে ছোট আশ্রয় পেয়েছি। দিন দিন যেন পৃথিবীটাও ছোট হয়ে আসছে। চারদিক থেকে যেন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। হয়তো আমাকেও অভ্যাস করতে হবে। কিন্তু মনতো আবদ্ধ থাকতে নারাজ, তাই সারা দিনের শেষে মনের খোরাকের খোঁজে হাটা পথেই শহরের দিকে ছুটি, পনেরো মিনিটের পথ। কীজানি শহরের বিশালতাকে যদি মনে ধারণ করতে পারি। কিন্তু শহরটি গত দুবছরে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। দ্রুত যেন রং বদলাচ্ছে।

মানুষ ও কি রং মাখছে-!

রং মাখলেই মানুষতো আর বদলায় না।

মেটে পথ খনিকটা পেরিয়েই রুট নং-৬, সোজা চলে গেছে বিশাল শহরটির দিকে। সেই রাস্তা দিয়েই রোজ কিছু দুর পদভ্রমন চলে। যতটা পারা যায় নতুন রং চোখে লাগিয়ে ফিরি, যদি তাল মেলানো ভার হয়।

প্রথম সপ্তাহের ছয়দিন পেরিয়ে আজ রবিবার। শুধু একটি দিন একটু নিয়ম ছাড়া, অফিস যাওয়ার তাড়া নেই, নেই কোনো সমীকরণ, নেই কোনো ঘড়ির কাঁটা, চোখা-চোখি, মুখা-মুখি সকলের সঙ্গেই, বেশ ভালো লাগে। আমার কলীগ্ (Colleague) ৬ নং রুটেই

ফ্ল্যাট নিয়েছেন, পায়ে হাটায় পনেরো মিনিটের পথ। প্রায়ই বলেন আসতে , তাঁর-স্ত্রী নাকি 'ইটালিয়ান রেসিপি' শিখেছেন। বোস বাবু গত সপ্তাহেই স্ত্রী-কে ব'লে রেখেছেন আমি আসবো ব'লে। কাঁচা পথটা পেরিয়ে এবার শহর অভিমুখী রুট-নং-৬ এ সেই ফ্লাটে যাবো।

তবে বাসষ্টপে লোকের ভিড় আজও!

আজতো ছুটির দিন!

প্রায় সকলেই নাকে কাপড় চাপা দিয়ে কেন?

করপোরেশনের ময়লা ফেলার গাড়িটা কি করছে?

কাছে গিয়েবোঝা গেল ব্যাপারটা। বলাবলি করছিল তারা অনেক খোঁজখবর শেষে বৃদ্ধাশ্রম থেকে ঠিকানা জোগাড় করে ছেলেকে খবর দেওয়া হয়েছে, কাছেই কোনো ফ্ল্যাটে থাকেন ভদ্রলোক সস্ত্রীক। বেসরকারী বৃদ্ধাশ্রমটির নিয়মিত বকেয়া থাকায় বিতাড়িত হয়ে শেষে বাসষ্টপ বৃদ্ধার আশ্রয় হয় গত তিনদিন যাবৎ। গতরাতের মুষলধারার বর্ষণে শেষে বৃদ্ধার প্রাণ চলে যায়। ছেলের বিলম্বে শব হতে দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে, তাই পরিবেশ রক্ষায় করপোরেশনের গাড়ি। সহসা যেন বুকের ভেতরটা গুম্‌রে উঠলো।

তখনই উল্টোপথে ফিরছিলাম সেই মেটে পথ ধরে। একটি বালক, তার মায়ের কোলে বহনরত- দৃশ্যটি দেখে আশ্চর্য্যই হলাম, কারণ মা-টির চোখে মুখে বিন্দুমাত্র ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করা গেল না, আর বালকটিও পরম আনন্দেই ছিল। বালক হলেও শিশু বটে- শরীরের অর্ধেকটা 'পোলিও'-তে অকেজো।

ঘরে ফিরে এলাম। কিন্তু মাথার ভিতরে উত্থিত প্রশ্নতরঙ্গ গুলিকে শান্ত কে করবে ?

একি বর্তমানের চরম বাস্তব-না নিজেরই অনাগত ভবিষ্যতের এক ছবি।

স্থির হবার চেষ্টা চললো অনেকখন।

ঘুরে ফিরেই যেন ছবি দুটি জেগে উঠছিল মনের ভিতর।

কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না রং দুটিকে। দিনটি কেটে গেলো .....

পরদিন আবার ঘড়ির কাঁটা ধরে রুট নং-৬ এ যাত্রা শুরু।

****

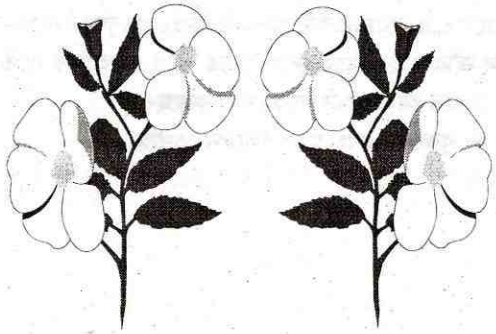

বৃদ্ধার চাতুরী

সংসার জীবনে নিতান্তই অসহায় অবস্থা ছিল অন্ধ ভিক্ষুকটির। গ্রাম থেকে একটু দূরেই ছোট এক কুটিরে এখন জীবনের শেষ দিন যাপন করছে। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন তার পরিবার ছিল। গ্রামটি ভীষণ ভাবে গাছপালায় আবৃত, বহু বৎসর পূর্বে দাবানলে বৃদ্ধার সর্বস্ব জ্বলে যায়, খোয়াতে হয় নিজের চোখ দুটিকেও, এখন বৃদ্ধা ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে।

সারা দিনের শেষে বৃদ্ধা যখন আপন কুটিরে ফিরে আসে, পূর্বস্মৃতি প্রায়ই তাকে পীড়া দেয়, অসহায় অবস্থায় তাই দুচোখ ভরে অশ্রু ধারা বয়ে চলে। তার এই দুঃখের অবস্থা স্বর্গদেবতার কাছেও বোধ হয় অসহনীয় হয়ে উঠলো। তাই দৈবক্রমে স্বর্গদেবতাও একদিন নেমে এলেন তার দুঃখ মোচন করার অভিপ্রায়ে।

প্রথম অবস্থায় বৃদ্ধার মনে হলো সেই নির্জন নিবাসে কোনো অশরীরী প্রেতাত্মা তার নিবাস অধিকার করতে এসেছে। অসহায় অবস্থায় বৃদ্ধা স্বর্গের সহস্র দেবতার নাম জপ করতে শুরু করলো। স্বর্গদেবতা তার ভুল ধারনা ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করলে বৃদ্ধা প্রমানপত্র চাইল স্বর্গদেবতার কাছে। তখন স্বর্গদেবতা বলেন- "ওরে মূর্খ তুইকাঁদিস কেন? আমি তোর উদ্ধারের জন্য এসেছি। তবে তুই শুধু ইচ্ছামতো একটি 'বর' ই চাইতে পারবি আমার কাছে।"

এবার বৃদ্ধা ভীষন সমস্যায় পরলো, কারন শর্তানুযায়ী যে একটি বরই চাইতে পারবে, অথচ তার সমস্যা হলো অনেক। একবার ভাবতে লাগলো নিজের জন্য দুটি চোখ-ই চেয়ে নেবে আবার ভাবতে লাগলো শেষ কালের জন্য ছেলেপুলে চেয়ে নেবে। পরক্ষনেই ভাবতে লাগলো টাকা পয়সা ঘর বাড়ী চাইবে, কিন্তু তখনই ভাবতে লাগলো এসব চেয়ে লাভ কি, নিজের জন্য কিছুকাল আয়ু চেয়ে নেবে। বৃদ্ধার দোদুল্যমান অবস্থা দেখে স্বর্গদেবতা পরদিন আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যান। কিন্তু বৃদ্ধার সেই রাত্রে ঘুম হলো না, সারা রাত বৃদ্ধা এই চিন্তা করেই কাটিয়ে দিল।

পরদিন রাতে একই সময়ে স্বর্গদেবতা পুনরায় আবির্ভাব হলেন। পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আবার বর চেয়ে নেওয়ার জন্য বললেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বৃদ্ধা কিছুক্ষন ভাবতে লাগলো, হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ বেগে তার মাথায় একটি বুদ্ধির উদয় হলো। বৃদ্ধা বললো- "আমার এমন বর দিন যেন আমি শেষ জীবনে হাসিমুখে দেখে যেতে পারি যে আমার নাতি নাতিনীরা দালান বাড়িতে সোনার সাটে বসে আমার চারিদিকে খেলা করছে।"

স্বর্গদেবতা সব বুঝলেন এবং হেসে বললেন 'তথাস্তু'।

দীপিকা দাস
স্নাতক প্রথম বর্ষ

একটু হাসো

১) সপ্তম শ্রেনীর রিয়া সমাজ বিজ্ঞানের বই থেকে ধর্ম সর্ম্পকে চিৎকার করে পড়ছিল, তা শুনে বাবা রিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন? সবধর্মের লোক ভাল বাসে এমন দুজন দেব-দেবীর নাম বল?

রিয়া ঝটপট উত্তর দিল- কপিল দেব ও শ্রীদেবী।

২) বিচারক-তুমি ঠিক থানার সম্মুখেই কেন চুরি করতে গেলে? সেখানে ধরা পড়ার বেশি ভয়।

চোর- ধরা পড়ে যেন বেশি দূর হাঁটতে হয় না। তার জন্য স্যার।

৩) শিক্ষক- তোমরা জান ভাল্লুকের কেন লম্বা চুল হয়?

ছাত্ররা-হ্যা, কারন জঙ্গলে কোন সেলুন নেই সেই জন্য।

পাত্র (পাত্রীকে)- তুমি কতটুকু পড়াশুনা করেছ?

পাত্রী-বি.এ. পর্য্যন্ত।

পাত্র-মাত্র দুইটা অক্ষর পড়েছ তাও ভুল।

স্ত্রী (স্বামীকে কাঁদতে কাঁদতে)-তুমি যখন বিদেশী মদ খেয়ে আসো তখন আমাকে 'পরী' বল, যখন দেশী মদ খেয়ে আসো তখন 'রানী' বল, আজকে কি মদ খেয়ে আসছো যে আমাকে 'চুরেল' বললে?

স্বামী- আজকে আমি মদ না খেয়েই এসেছি।

সংগৃহীত
দীপিকা দাস

কবিতা গুচ্ছ

ঘুণ

ঘুণ-১
ঘুণ-ঘুণ-ক্ষয়ে চলে-
জীর্ণ শেষ নীড়।
অস্থি পাঁজর দশমেতে-
অস্থির মন্দির।।
*****
ঝর-ঝর, ঝরে যায়-
মন থেকে মন।
বাঁধন বুনট শিথিল ক'রে-
চলে প্রতিক্ষণ।।
*****
কঁচি-কাঁচা বাদ নয়
ঘুণ সারা মনময়।
শাল-শেগুণেও ঘুণ আজ-
সংসার ঘুণময়।।
ঘুণ-২
ঘুণ লেগেছে, ঘুণ চারিদিকে,
অপ্রাণ জনতার গভীরে।
দুর্বার সোচ্চার, প্রতিবাদ হেন তার
স্থানু কেউ নহে রে।।
*****
তিলে তিলে লেশ করিতে নিঃশেষ,
আজি নাশিতে তন্ময়।
রথ-পথ, তীব্র আকাঙ্খাতে ধায়
ধরে থাকিবে শুধু প্রাণময়।।

রাজীব সাহা
বাংলা বিভাগ

আমার ইচ্ছে

আমার ইচ্ছা করে-
যাই চলে বহু দূরে।
নাইবা থাকলো সঙ্গী-সাথী-
তবু তো রবে প্রকৃতি।
আমার ইচ্ছে করে-
থাকতো যদি দুটো ডানা
উড়তে পেতাম পাখির মতো,
করতো না কেউ মানা।।
আমার ইচ্ছা করে-
জন্ম নিতে পুরুষ হয়ে।
সেবা-ভার নিয়েও তবু-
হয়না থাকতে ভয়ে ভয়ে।।
দিন দিন নিজেকে করে চলেছি ক্ষয়
এখানেই আমার অস্তিত্বের পরাজয়।

তনুশ্রী রায়
স্নাতক ২য় বর্ষ।

শিক্ষাগুরু

শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন,
শিক্ষকেরা আমাদের গুরুজন,
শিক্ষা দিতেই তাদের আগমন।
*****
শিক্ষকেরা আমাদের জ্ঞানদাতা,
শিক্ষকের অবহেলা যেথা,
সেখানেই জীবনের ব্যর্থতা।

পায়েল ধর
স্নাতক ২য় বর্ষ

হৃদয়ের গান আজ বন্ধ

ঠিকানা হারিয়ে
আজ

আমার রোদন ভরা বসন্ত

বুকে জ্বলে আগুন
চোখে কাঁপে মনি

আর
ঠিকানা হারিয়ে
আজ আমার

রোদন ভরা বসন্ত

হৃদয়ের গান
আজ বন্ধ
স্তব্ধ

নীলিমা গোস্বামী শর্মা
অসমীয়া বিভাগ

পালা বদল

শৈশবের হাত ধরে আসে কৈশোর,
গ্রীষ্মের সিড়ি ভেঙ্গে বর্ষার ঝর ঝর।
পূবে ভানুর উদয়,
পশ্চিমে হয় বিলয়।
দুখের নিশি পার করে আসে সুখ,
উত্থান-পতনেই বেঁচে থাকার সুখ।
জন্ম-মৃত্যুর খেলা,
ভাঙা-গড়ার মেলা,
এসবই জীবনের লীলা।

অলি ভট্ট
স্নাতক প্রথম বর্ষ।

বুক জুড়িয়া

তুমি আছ
আমার
বুক জুড়িয়া

এজন্য
আমি থাকতে পারি
তুমি না থাকলেও
আমার সঙ্গে

মৌ-মাছির মত
কাজ আমি
করতে পারি

অশরীরী এক জীবনী শক্তি
পেতে থাকি আমি
জীবন জুড়ে

নীলিমা গোস্বামী শর্মা
অসমীয়া বিভাগ

বর্ষা

বর্ষা মানে মেঘলা আকাশ
মেঘ ডাকে কড়-কড়,
বর্ষা মানে মাতাল হাওয়া
রিমঝিম ঝর-ঝর।
বর্ষা মানে ভিজে মাটির
সোঁদা সোঁদা গন্ধ,
বর্ষা মানে গাছের পাতায়
এলো নতুন ছন্দ।
বর্ষা মানে চাষীর প্রাণে
জাগে নতুন দোলা,
সকাল বেলায় লাঙল নিয়ে
মাটের দিকে চলা।

প্রিয়ঙ্কা চৌধুরী
স্নাতক ২য় বষ

দুটি ভাবনা

১

নির্জনতার জনঅরন্যে
সারাবেলা হেসেখেলে,
সর্বহারা সবপাওয়ার
দল,
অর্ধাহারে অনাহারে
কাটিয়ে
ফেলেনা দীর্ঘশ্বাস
করেনা হা-হুতাশ
নাই সঞ্চয়ের বাসনা
নাই ভবিষ্যতের ভাবনা
শুধু
ভোগ আর ভোগ।

২

সকাল গড়িয়ে আসে দুপুর
দুপুর পেরিয়ে নামে সাঁঝ
দিনের শেষে আসে রাত
নিয়মের হাত ধরে চলে সংসার।

প্রকৃতির নিয়মে জগত সংসারে
চলছে সব অনু-পল-দণ্ডের বিচারে
জীবনে কেন নিয়ম ভাঙার নিয়ম
কেন হয় বারে বারে ছন্দপতন।

ডঃ সুনন্দা দাস
বাংলা বিভাগ

পঙ্গুর বসন্ত

একবার তার কাছেও এসেছিল বসন্ত
পঙ্গু বলে কি তার জীবনে বসন্ত আসবে না?
বসন্ত সময় মতো ডাক দিয়ে গেছে ঠিকই,
কিন্তু এ যে বসন্তের ডাক,
এবং সে ডাকে দিতে হবে সাড়া,
সে তা বুঝে উঠতে পারেনি,

বুঝলেও না বোঝার ভান করেছে,
বেদনা লুকিয়ে রেখে
হেসে উড়িয়ে দিয়েছে.....
শরীরের কোন একটা অঙ্গ একটু অচল,
মনও কি তাই বলে অচল?
হয়নি নাকি সে কোনো স্বপ্নে সচল?
কোনো রং কি কখনও লাগেনি তার মনে?
যৌবনের ডাক কি আসেনি তার জীবনে?

হয়তো তার মনেও আবির রঙা
রং লেগেছিল.....
কিন্তু পঙ্গুত্বের অন্ধকার
তার আবিরের রংকে
কালো রংএ ঢেকে দিলো
তার হৃদয়ে মুঠো মুঠো বেদনা
ছড়িয়ে দিলো.....
জন্মদিন নাকি কোন এক বিশেষ পূর্ণিমায়
মা আদর করে নাম রেখেছিলেন অরুনিমা
কিন্তু সেই পূর্ণিমার চাঁদের আলো
তার জীবনে ছড়ালো শুধু কালো
পঙ্গু করল তাকে জীবনের জন্য
এই মানবজীবন পেয়েও সে কি ধন্য!

শিবানী দে
বাংলা বিভাগ